প্রথম অধ্যায়

আশালতা সিংহ ও তাঁর সমকাল

শিক্ষামনন, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি প্রভতি সমস্ত বিষয়েই মেয়েরা চিন্তনের ক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষ এবং সব কিছুতেই পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য। খাতায়-কলমে এই মতটি স্বীকৃতি পেলেও আজও বহু ক্ষেত্রেই তাকে মেনে নিতে পারে না পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই। আর আজ থেকে একশোবছর আগে বিশেষত ভারতবর্ষীয় সমাজ-পরিবেশে বিষয়টা ছিল আরও গোলমেলে। ঔপনিবেশিক নারীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বের নারীদের কখনোই একাসনে বসানো যায় না। কারণ ঔপনিবেশিক নারীরা দু'দুবার নিষ্পেষিত হয় — ঔপনিবেশিক শাসক এবং পুরুষতন্ত্র — এই দুই নিষ্পেষক কারও থেকেই সে রেহাই পায় না। সাদা বর্ণের কোন নারীকে ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার কখনও হতে হয়নি — কাজেই প্রথম বিশ্বের নারীর অভিজ্ঞতা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের নারীর অভিজ্ঞতাকে মাপতে যাওয়া মুর্খামি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর ঔপনিবেশিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিখ্যাত তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বাংলারই মেয়ে। গায়ত্রীর 'can subaltern speak' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রায় মিথ হয়ে গেছে। প্রবন্ধটিতে স্পিভাক প্রশ্ন তুলেছেন সাবঅল্টার্নের পক্ষে কি নিজের কণ্ঠে কথা বলা আদৌ সম্ভব? মহিলা সাব অল্টার্নের পক্ষে তা বোধহয় আরও অসম্ভব।

সময়কালের দিক দিয়ে বিট্রিশ ঔপনিবেশিক ভারতে সাহিত্য চর্চা করেছিলেন আশালতা সিংহ। আশালতা যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় তাঁর জন্মস্থান বিহারের ভাগলপুর ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান। স্বর্গীয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্ট, নিরূপমা দেবী সহ বহু সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম এই ভাগলপুরেই বিকশিত হয়েছিল। এ সময় মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সময়কালের দিক দিয়ে সাহিত্যিক অশালতা সিংহের চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। জ্যোতির্ময়ী দেবী আশালতার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড় হলেও আশালতার সমসময়ে তিনিও সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। এই সমস্ত লেখিকাদের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে লেখিকা আশালতা সিংহের অবস্থানটা স্পষ্ট করে তোলাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

আর বহু লেখক লেখিকাই আশালতার সম সময়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। কিন্তু সকলকে এই আলোচনাার মধ্যে নিয়ে আসা শ্রম সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। কাজেই সেই দিকটি সযত্নে পরিহার করেছি। প্রতিনিধি স্থানীয় দুজন লেখিকাকে বেছে নিয়েছি লেখিকা হিসাবে আশালতার অবস্থানকে স্পষ্ট করতে। অশালতা, অশাপূর্ণা এবং জ্যোতির্ময়ীদের সংক্ষিপ্ত তুলনার মধ্যে দিয়ে যে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে পাঠকের নজরে পড়ে তা হল এদের তিনজনের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। এই জনপ্রিয়তিার কারণ অনুসন্ধান করা যাক।

শিল্পীর কোন খ্যাতির প্রত্যাশা থাকবে না — এটা হয় না। পাঠকের চিত্তে নিজের ভাবনাটি গেঁথে দেবার কামনা যেমন তাঁর থাকে তেমনি সব শিল্পীই চান সংবেদনশীল, অনুরাগী এবং সহমর্মী পাঠক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উনিশ শতকীয় নবজাগরণ সঞ্জাত সংস্কারগুলি হিন্দু বাঙ্গালী জীবনে স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক ও পারিবারিক গঠনে মনু-শাসিত সূত্রগুলিও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মনুশাসিত সূত্র অনুযায়ী নারী হবে স্বামীনিষ্ঠ, সেবা পরায়না, গৃহ রক্ষায়িত্রী এবং সন্তানের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা জননী। উপন্যাসে যদি মেয়েদের দেখা যায় ভিন্নতর অবস্থানে তা হলে সাধারণ বাঙালি পাঠক ঐ উপন্যাস গ্রহণ করে না। ফলে ঔপন্যাসিকের জনপ্রিয়তা বিঘ্নিত হয়। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালি নারী সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন তরুণী বিধবা কিংবা বাল বিধবা সম্বন্ধে, তাদের জীবন আকাঙক্ষা প্রেমাকাঙক্ষা নিয়ে উস্‌কে দিয়েছিলেন তৎকালীন পুরুষ লেখকোও। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষনীয় — বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রগুলি — সধবা বা বিধবা যাই হোক না কেন তারা নিঃসন্তান। এই নারীরা অনেকেই স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। তাই সূর্যমুখী, শৈবলিনা, রোহিনী থেকে বিমলা, চারুলতা, বিনোদিনী, কিংবা কিরণময়ী, অচলা কারোরই সন্তান নেই। সন্তানের জননী হলে ঘরে থেকে অপত্য স্নেহ সঞ্চার করা ছাড়া নারীর আর কোনও প্রধনা কাজ যেন থাকবে না — এমনই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির পাঠকের চাহিদা। জননী হলেই তাকে সতী নারী হতেই হবে — এই যখন বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা পাশ্চাত্য দেশের পাঠক কিন্তু তা থেকে অনেকটাই আলাদা। লিও তলস্তয় লিখেছিলেন আনা কারেনিনা। প্রতিষ্ঠিত স্বামী এবং দেশ বছরের বালক পুত্রকে ছেড়ে তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল আনা। দেশ কালের প্রেক্ষাপটে দেশবাসীর মানসিকতার অনুবূল গল্প উপন্যাসের কাহিনী চরিত্র নির্মিত হলে তবেই সে উপন্যাস জনপ্রিয়তা পায়।

জনপ্রিয়তা পাবার এই দিকগুলিত নিয়ে আশালতা হয়তো সেভাবে ভাবেননি উপরন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন বহু পঠিত হবার দরুণ অজান্তেই আশালতার লেখায় তার কিছু কিছু প্রভাব পড়ে।

আমাদের মনে পড়বে আশালতার লেখা উপন্যাস ‘জীবনধারা’য় নায়িকা এষার বিয়েতে এষার

প্রেমিক গানের শিক্ষক দেবেশ এষাকে অ্যানা কারেনিনা বইটি উপহার দিয়েছিল। কিংবা 'উমার আস্যা' গল্পেও দেখি উমার বিয়েতে তার ইংরেজী অধ্যাপক তাকে অ্যানা ক্যারেনিনা উপহার দিলে উমার স্বামী তাকে ড বৎসনা করে এবং জানিয়ে দেয় এখন থেকে ঐ সকল বই যেন উমা না পড়ে কারণ বূলবধূর সেটা পড়া উচিত নয়।

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পরিবারের লোকেরা পছন্দ করে না বলে অনেক মেয়েরই লেখার ইচ্ছা এবং প্রতিভা দুই-ই লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল আশালতা পিতৃপরিবারে অত্যন্ত খোলামেলা পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। ভাগলপুরে উদার সাংস্কৃতি মনস্ক পরিবার জন্মাবার দরুণ আশালতা প্রগতিশীল ইংরেজী সাহ্যি দর্শন প্রচুর পড়েছিলেন। সেই সময় সমাজের অন্যায় পীড়ন এং পুরুষের অকারণ শাসন কিছুই জীবনে তখনও দেখেননি কিন্তু রক্ষণশীল গ্রামীণ জমিদার বাড়িতে বিববাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে বিশেষত দুবরাজপুরে থাকাকালীন শ্বশুরবাড়ির সান্নিধ্যে এলে ঐ পরিবেশের সঙ্গে তার খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ডাক্তার হলেও রক্ষণশীল সমাজেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অন্যদিকে আশাপূর্ণা দেবী নিম্ন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী পিতামহীর সান্নিধ্যে ছোট থেকেই ছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের মেয়েদের প্রতি অকারণ শাসন তিনি অনেকটাই প্রত্যক্ষা করেছিলেন। মেয়েদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে পিতামহীর কঠের নিষেধাজ্ঞার জন্য আশাপূর্ণা কখনো স্কুলের গন্ডিই মারাননি। তাই বঙ্গদেশে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থানটি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আশাপূর্ণার সামনে।

জন্ম সময়কাল, পিতৃপরিবার, পারিপার্শ্বিক অবস্থান সব কিছুর প্রেক্ষিতে আশালতা, আশাপূর্ণা, জ্যোতির্ময়ীর অবস্থানটি এবার দেখা যাক।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিহারের ভাগলপুরে ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই। দিনটি ছিল শনিবার, বাংলা ১৩১৮ সালের ৩০ আষাঢ়। যদিও আশালতাদের আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায়। পিতামহ চন্দ্রশেখর সরকার তখনকার দিনের আইনজীবী ছিলেন। আশলতার পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার, মা যোগমায়া দেবী। মৃত সন্তানদের হিসেবের বাইরে রাখলে আশালতারা ন'ভাইবোন। সাত ভাই, দুই বোন। সবার বড় আশালতা। ভাগলপুরের খঞ্জরপুর অঞ্চলে গঙ্গার সন্নিধানে চন্দ্রশেখরের তৈরী অট্টালিকা যা বড়োবাড়ি নামে খ্যাত; ঐ বাড়িতেই আশালতার জন্ম হয়।

আশাপূর্ণ দেবী আশালতার চেয়ে দু'বছরের বড় ছিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯ সালে, ৮ই জানুয়ারী; বাংলা ১৩১৫ সনের ২৪শে পৌষ, শুক্রবার। জন্মস্থান মামার বাড়ী — উত্তর কোলকাতার পটলডাঙ্গা। অশাপূর্ণা দেবীর পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মা সরলাসুন্দরী। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেকালের

বিখ্যাত সি. ল্যাজরাস কোম্পানীর ডিজাইনার বা নকশা আঁকার কাজ করতেন। এঁদের আদি পিতৃনিবাস হুগলী জেলার বেগমপুরে। হরেন্দ্রনাথ কোম্পানীর সাহেবদের আনুকূল্যে তদানীন্তন আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে, খান্না সিনেমের পাশে) একটি বড় বাড়ীতে বৃন্দাবন বসু লেনের যৌথ পরিবারের ভাড়াবাড়ী থেকে চলে গিয়ে নিজস্ব পরিবারের সকলকে নিয়ে গৃহস্থালী পাতেন। আশাপূর্ণা দেবী পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় তাঁর পিতামহীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল কারণ স্কুলে পড়লেই মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে — এ বিশ্বাস তাঁর বরাবরই ছিল এবং মাতৃভক্ত পুত্ররা মায়ের মতের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস কোনদিন দেখাননি।

জ্যোর্তিময়ী দেবীর জন্ম ২৩ জানুয়ারী ১৮৯৪ সাল বাংলা ১৩০০ বঙ্গাব্দে। জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশ থেকে অনেকটা দূরে রাজস্থানের জয়পুরে। পিতামহ সংসারচন্দ্র জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন যদিও পিতা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের যাবতীয় বিধি নিষেধ উপেক্ষা ক'রে শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী পিতার স্নেহছায়ায় আশালতার প্রতিভা বাল্যকাল থেকেই বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। ভাগলপুরে মোক্ষদা গার্লস স্কুলের ছাত্রী আশালতা সেকেন্ড ক্লাসে পড়তে পড়তেই পাঠ্যসূচি বহির্ভুত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের পাঠ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আশালতা এত বই পড়তে ভালোবাসতেন যে বই পেলে সব ভুলে যেতেন। ভাগলপুর ইনস্টিটিউট নামে শহরে একটি পুরনো ক্লাব ছিল। ঐ ক্লাবের লাইব্রেরীতে ভাল ইংরেজী বইয়ের সংগ্রহ ছিল প্রচুর আর ঐ ইনস্টিটিউটেরই একটি ঘরে তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার — বাংলা সাহিত্যের বইপত্র ওখানেও ছিল প্রচুর — এসব বই বিশেষত ইংরেজী বই আশালতাকে এনে দিতেন তাঁর পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার। আশালতা এবং তাঁর পিতা দুজনে মিলে মণি মজুমদারের কাছে ছবি আঁকাও শিখতেন। এছাড়া গান। জানা যায়, বিয়ের আগে আশালতা মার্গ সঙ্গীতের চর্চা করতেন। হেমেন্দ্রলাল রায়ের কাছে তিনি গান শিখতেন। বিয়ের পরেও আশালতা তেজনরায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপকদের কাছে লেখপড়ার চর্চা করেছিলেন। পিতা যতীন্দ্রমোহন সরকার আশালতার শিক্ষার জন্য তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপককে নিযুক্ত করে দেন।

আশাপূর্ণা দেবীর কথায় তাঁর পিতৃপরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পাট ছিল না। বলা বাহুল্য আশাপূর্ণারও স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তিনি বাংলা গল্প-উপন্যাসের বই প্রচুর পড়েছেন। আশাপূর্ণার মায়ের ছিল প্রবল সাহিত্যপ্রীতি। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন — ''তখনকার দিনের যত গ্রন্থাবলী সবই মার ছিল আর যত পত্র-পত্রিকা তখন বেরোত সেগুলো সবই বাড়িতে আসত। তাছাড়া তিন-তিনটি লাইব্রেরী থেকে বই আসত।[১] আশাপূর্ণারা ছিলেন আট ভাইবোন।

দাদারা লেখাপড়া শিখেছেন কিন্তু বারো বছর বয়স থেকেই মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোনো বারণ ছিল। তবে বাবা শ্রী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছবি আঁকতেন। ভারতবর্ষ পত্রিকাতেই তাঁর আঁকা অনেক ছবি ছিল। সম্পাদক জলধর সেন ছিলেন হরেন্দ্রনাথবাবুর বিশেষ পরিচিত। এছাড়া সাহিত্য জগতের অনেকের সঙ্গে পরিচয় থাকায় তাঁরা আশাপূর্ণাদের বাড়িতেও আসতেন।

জ্যোতির্ময়ীদেবীদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। ছোট থেকে নানা মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ বাড়িতেই হয়েছিল। বাড়িতে সামান্য লেখাপড়ার সুযোগও তাঁর হয়। জ্যোতির্ময়ীদেবীর বিবরণ অনুযায়ী নিমাই পণ্ডিত তাদের মত বালক বালিকাগুলিকে পড়তে শেখালেন। প্রবাসে থেকেও এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বঙ্গদেশবাসিনী অন্য লেখিকা ভগিনিদের তুলনায় অধিক সুবিধা পাননি। অথচ তিনি জানতেন জয়পুরে একটি মিশন স্কুলের অস্তিত্ব রয়েছে।

আশালতা, আশাপূর্ণা, জ্যোতির্ময়ী — প্রত্যেকেরই ছোট থেকে পড়ার প্রতি অসীম আগ্রহ ছিল। আর সেই সঙ্গে এঁদের পিতা- মাতারা প্রত্যেকেই এঁদের লেখা পড়া শেখানোর বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। যদিও এঁদের মধ্যে আশাপূর্ণাদেবী এবং জ্যোতির্ময়ীর স্কুলে যাবারও সৌভাগ্য হয়নি। তবে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আগ্রাসী পাঠক।

আশালতার পরিবারের অভিভাবকেরা মেয়েদের পড়াশোনা বা স্বাধীনভাবে গান-বাজনা, ছবি আঁকা শেখার ব্যাপারে যতটা উৎসাহী ছিলেন বিয়ে প্রভৃতি সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের যাবার উপায় বা অভিপ্রায় কোনটাই ছিল না। তাই জাতি-ধর্ম-গোত্র বিচার করে তেরো বছর ছয় মাস বয়সে আশালতার বিয়ে হয় বীরভূমের রক্ষণশীল জমিদার বংশে, অবিনাশচন্দ্র সিংহের পুত্র ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে। আশালতার সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন তিনি আর.জি.কর মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

বিয়ের পর আশালতা চলে আসেন অজ পাড়া গাঁ বাতিকার-এ। ভাগলপুরের খোলামেলা সাহিত্য-সঙ্গীত-চর্চা সমৃদ্ধ পরিবেশ ছেড়ে নানান কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ অজ পাড়া গাঁ-এ থাকতে আশালতার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বিশেষত আশালতা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষীও বটে। আশালতার যখন বিয়ে হয় তন তিনি ছিলেন ম্যাট্রিকুলেশনের সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্রী; পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট ক্লাসে উঠবেন। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া আশালতার এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়[২] — আশালতা তার শ্বশুরবাড়ি বাতিকার গ্রামে লুকিয়ে লেখাপড়া চর্চা করতেন। দরজা জানালা বন্ধ করে এমনকি খড়খড়ির ফাঁক ন্যাকড়া দিয়ে বুজিয়ে লেখাপড়া করতেন যাতে কেউ দেখতে না পায়।

উপরন্তু আশালতার শ্বশুরবাড়ি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। ভাগলপুরে উদার সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারে

জন্মানোর দরুণ আশালতা প্রগতিশীল ছিলেন, ইংরেজি-সাহিত্য-দর্শন ইতিমধ্যে প্রচুর পড়েছেন, সেই সময়কালে মেয়েদের প্রতি অন্যায় পীড়ন এবং পুরুষের অকারণ শাসন কিছুই প্রায় তখনও জীবনে দেখেননি কিন্তু রক্ষণশীল জমিদার বাড়ির গ্রাম্য পরিবেশে বিবাহসূত্রে এসে আবদ্ধ হলে বিশেষত দুজরাজপুরে থাকাকালীন শ্বশুরবড়ির সান্নিধ্যে এলে ঐ গ্রাম্য অসংস্কৃত, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে তাঁর খাপ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিয়ের পর পর আশালতার স্বামী ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ডাক্তারী পাশ করে প্রথমে সিউড়িতে, তার কিছুদিনের মধ্যে ভাগলপুরে প্রাক্‌টিস শুরু করেন। এরপর ১৯৩৫ সাল নাগাদ তিনি ভাগলপুর ছেড়ে দুবরাজপুরে থাকতে শুরু করেন। স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ ডাক্তার হলেও রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আশালতার চেয়ে দু'বছরের বড় আশাপূর্ণার বিবাহ হয় ৬ই শ্রাবণ ১৩৩১ সালে, কৃষ্ণনগর (মাঝের পাড়া) নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরোজিনী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে। বিবাহের পর তাঁকে যেতে হয় কোলকাতা ছেড়ে দূরে কৃষ্ণনগরে। তখনই আশাপূর্ণা অনুভব করেন কোলকাতা তাঁর কাছে কত প্রিয় ছিল। বিবাহের পর কলকাতা থেকে দূরে চলে যাবার সেই বিচ্ছেদই যেন বড় করে ধরা দিল। কোলকাতার প্রতি আশাপূর্ণার এই আকর্ষণ ব্যর্থ হয়নি। পরে এই কোলকাতাই হয়ে ওঠে আশাপূর্ণার কর্মক্ষেত্রের প্রধান কেন্দ্র। আশপূর্ণার স্বামী কালিদাস গুপ্ত উপার্জনের কারণে কোলকাতায় পাঁচ-ছ দিন কাটিয়ে যখন সপ্তাহান্তে ছুটে আসতেন বাড়িতে তখন সেই টানা পোড়েনের জীবন খানিকটা কষ্টদায়কই হয়তো ছিল তাই দেখা যায় দু বছরে ভেতরেই কোলকাতাতে বাসা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আশাপূর্ণা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী সহ কোলকাততার ভবানীপুর রমেশ মিত্র রোডে বাসা ভাড়া করে বসবাস শুরু করেন। শ্বশুর নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর টাউনসেন্ড রোডের একটি বাড়িতে কিছুকাল এবং পরে ৭৭নং বেলতলা রোডের বাড়িতে দীর্ঘ চব্বিশ বছর তাঁরা কাটিয়েছেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। এখানেই তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যু হয়।

১৯৬০ সাল থেকে স্বামী কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে নিজস্ব পরিবার-পুত্র সুশান্ত, পুত্রবধূ নূপুর ও দু'বছরের পৌত্রী শতরূপাকে নিয়ে চলে আসেন গোলপার্কের কাছে গভর্নমেন্ট হাউসিং-এর ফ্ল্যাটে। সেখানে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তারা বসবাস করেন যতদিন না গড়িয়ার ১৭ কানুনগো পার্কে তাদের নিজস্ব বাসভবন তৈরী হয়। ৭০-এ জমজমাট গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁরা গড়িয়ার বাড়ীতে আসেন এবং এখানেথ তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটান।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর বিবাহ হয়েছিল হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়ায় সচ্ছল, অভিজাত ও সংস্কৃতি মনস্ক এক পরিবারে। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ছেদ পড়ে তাঁর সংসার জীবনে। পাটনায় স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১৮ সালে ছয়টি নাবালক সন্তান নিয়ে অকুল পাথারে পড়েছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স নয় বছর, কোলেরটি চার মাসের।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্বামীর পরিবার হুগলি অঞ্চলের লোক হলেও কাজের সুবিধার জন্য তাঁরা পাটনায় বসবাস করতেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ঘর বসত করতে পাটনায় এসেছিলেন।

বিধবা হবার পর তিনি যখন পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়িতে চলে এসেছেন তখন পরমাসুন্দরী মা শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রৌঢ়া, বিধবা ছয় সন্তানসহ আশ্রিতা কন্যাকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। সন্তান সহ বিধবা মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছে যে বাপের বাড়ি সে বাড়ির চল্লিশ পঞ্চাশ জন সদস্যের রান্নার ভার অতএব এসে পড়ে জ্যোতির্ময়ীর উপর। সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত চলে রান্নার কাজ। বাইরের সকলে দেখে জ্যোতিই যেন বাড়ির গিন্নি কিন্তু তিনি বোঝেন, 'এখানকার অন্নে আমার কোন অধিকার নেই। এই অট্টালিকার একখানি ঘরেও আমার থাকার দাবি নেই। একটি আচ্ছাদনও যদি এঁরা না দেন আমার অর্জনের, সংগ্রহের সামর্থ্য নেই।'[৩]

পরলোকগত পিতামহের সমাধি মন্দিরে মর্মরমূর্তি গড়তে শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন নারায়ণ কেশব দেওল। তাঁর কাছ থেকে জ্যোতির্ময়ী পেয়েছিলেন পাঁচখণ্ড রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে ধীরে ধীরে তিনি ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ভুলতে লাগলেন।

বাপের বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে মনের নানা প্রশ্নের জবাব না পেয়ে যখন পথ হাতড়াচ্ছেন তখন সম্পর্কিত এক ঠাকুরর্দা জন স্টুয়াট মিলের 'সাবজেকসান অব উওম্যান' গ্রন্থটি তাঁকে দেন। তাঁর কথায় 'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে' সেই বই পড়া শেষ করেন। তিনি লিখেছেন — ''মনের নানা প্রশ্নের সঙ্গে বইয়ের সমস্যা ও সমাধান প্রশ্নোত্তর মিলেই যায়।''[৪]

আশালতা বিয়ের পর অজ পাড়া গাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অন্ধ কুসংস্কারচ্ছন্ন বিভিন্ন লোকাচারের সঙ্গে নিজের প্রগতিশীল মানসিকতাকে কখনোই খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। স্বামী-শ্বশুরবাড়ি সব কিছু ছেড়ে তিনি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়াও করতে চেয়েছিলেন। আশালতার কন্যা নীলিমা সরকার একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন — ''...বিবাহের পরেই আশালতা সিংহ শান্তিনিকেতনে যেতে চাইলে তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। তিনি সেখান থেকে লেখাপড়া করবেন এবং আর শ্বশুরবাড়ি যাবেন না — বোধহয় এইরকম একটা বাসনা তাঁর ছিল।''[৫] কিন্তু তা যখন সম্ভব হল না তখন তিনি নিজের কথা বলার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কাকে বলবেন? হয়তো সেজন্যই মনের কথা, মননের কথা লেখা শুরু করলেন। প্রবন্ধ দিয়েই যার যাত্রা শুরু। মেয়ে হয়ে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে নিতে চাইলেন অন্যান্য নারীর স্বভাবের সঙ্গে। যদিও স্বভাব তৈরী করে দেয় সমাজ আর কলমও হয় তারই অনুসারী। পুরুষ এবং নারী দুজনের জীবনের অভিজ্ঞতা দুরকম। মেয়েদের জীবন প্রথম শ্রেণীর মানুষের জীবনের মতো সুখ-সুবিধায় ভর ভরন্ত থাকে না। সেই অভাবী দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের জীবনের ব্যথা, ক্ষোভ, ক্রোধও রূপ পেল আশালতার প্রথম লেখা 'নারী' নামক প্রবন্ধে।

১৩৩৫ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় 'নারী' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশালতাকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন যা ১৩৩৫ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'নারীর মনুষ্যত্ব' নামে ছাপা হয়।

যা লিখতে চান তা ফুটিয়ে তুলতে আশালতাকে বেগ পেতে হয়নি কারণ দেশী-বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাস, দর্শন চর্চিত তাঁর মনন-মেধা অনায়াসেই তাঁকে দিয়ে একবছরে আটটি প্রবন্ধ লিখিয়ে নিল। শুধু প্রবন্ধই নয় ১৩৩৫ সালে 'উত্তরা' পত্রিকায় আশালতার দুটি গল্পও ছাপা হল। গল্প দুটি হল যথাক্রমে — 'সমর্পণ' ও 'আবির্ভাব'।

আশাপূর্ণাদেবী স্কুলে যাননি। স্বয়ং আশাপূর্ণা এ বিষয়ে বলেছেন — পাঠ্য পুস্তক পড়ার কোন চাপ না থাকায় অপাঠ্য পুস্তক মনের আনন্দে যা হাতের কাছে পেয়েছিলেন সবই গলাধঃকরণ করেছিলেন।

পিতা এবং মাতার প্রসঙ্গেও আশাপূর্ণাদেবী লিখেছিলেন — ''মা'র জীবনে একটি পরমার্থ ছিল তা হল সাহিত্য আর বাবার ঐ একটি পরমার্থবাদে একশোটি পরমার্থ। তাস পাশা খেলা থেকে, মাছ ধরা, ফানুস ওড়ানো, কুস্তি শেখা — কী নেই তাতে।''[৬]

প্রত্যেকটি মানুষই পিতা ও মাতা এই দুটি ধারার সম্মিলিত নির্যাসেই তার বুদ্ধি, কৃষ্টি, মনন, আদর্শ সব কিছুকে পুষ্ট করেন। আর তাই বোধ হয় আশাপূর্ণদেবী তাঁর শিল্পী পিতার কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতি, বিশ্লেষণী শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তেমনই মাতৃসান্নিধ্যে তাঁর জেগেছিল সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অদম্য এক অনুসন্ধিৎসা।

বিভিন্ন বই অবাধে পড়ার মধ্য দিয়ে নেশার ঝোঁকে এক সময় হঠাৎ আশাপূর্ণার লেখার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছে থেকেই একটি কবিতা লিখে শিশুসাথী পত্রিকায় সেই লেখা পাঠিয়ে দেন। 'শিশু সাথী' পত্রিকায় লেখাটি তো ছাপা হয়ই তার উপরে কর্মাধ্যক্ষ রাজকুমার চক্রবর্তীর লেখা একখানা চিঠি — তাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল আশাপূর্ণাদেবী গল্প লিখতে পারবেন কিনা, যদি পারেন তবে যেন তা পত্রিকার দপ্তরে পাঠিয়ে দেন।

আশাপূর্ণাও বসে যান গল্প লেখার জন্য। সেই শুরু, আশাপূর্ণাদেবীর কথাতেই — ''তারপর আর কি! পীচ ঢালা রাস্তায় গড়গড়িয়ে গাড়ী চালিয়ে যাই। সে গল্প ছাপার পরই আবার চিঠি এসে যায়। আবার লিখি। ... অন্য শিশু পত্রিকা থেকেও চিঠি এসে পড়ে।''[৭]

জ্যোতির্ময়ীদেবীর বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে লেখাপড়ার সামান্য সুযোগ হয়েছিল। তবে সে সবই মাতৃভাষায়। ইংরেজী শেখার সুযোগ পাননি। বাল্যে প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক পড়েছেন। এরপর বিয়ের পর স্বামীর কাছে রাত জেগে আরও খানিকটা ইংরেজী শিখেছিলেন।

অকাল বৈধব্য যখন তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল হিন্দু যৌথ পরিবারের প্রত্যন্ত প্রদেশে তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মানসিক জগতে এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা আর এ থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মতো নিঃসঙ্গ অনেক মেয়েই, উচ্চশিক্ষা এবং বাইরের কর্মজগতের আলো থেকে যারা চিরকাল বঞ্চিত। ঘরে বাইরে দ্বিত্বের মধ্যে যে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয় তার উন্মেষের জন্য যে উচ্চশিক্ষা এবং সামাজিক ও সাহিত্যিক আদান প্রদানের প্রয়োজন ছিল জ্যোতির্ময়ীদেবী নিজে সেই উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও তিনি তার বাইরেই ছিলেন। তৎকালীন বাংলাদেশের নতুন আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মেয়েদের পক্ষেও অন্দরমহলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে বিদগ্ধ সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর নিজের প্রথম লেখা প্রসঙ্গে 'পাঠিকা থেকে লেখিকা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি থেকেই আমরা জানতে পারি ১৩১৭ থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে যখন তিনি পাটনায় ছিলেন তখন থেকেই গল্পলেখার কথা ভাবতেন। কিছু লিখলেই তা শেষ করতে পারেন না। সেইসময় মাসিকপত্র এবং লাইব্রেরীর বইও পড়তেন। আর তখনই ভাই-দেবর সম্পর্কিত কয়েকজন ছেলে এসে তাদের পত্রিকা 'নব আশা'র জন্য গল্প চায়। বহুদিন আগে শোনা তাঁর নিজের খুড়িমা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারাণী' উপন্যাসের অনুকরণে 'অনাথ বালক' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই 'অনাথ বালকের' আদলে তিনি একটি গল্প সাজিয়ে তাদের দিলেন। এতে অবশ্য জ্যোতির্ময়ী প্রশংসাই পেয়েছিলেন। এরপর বিধবা হবার পর জ্যোতির্ময়ীদেবী কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখলেন ভাতরবর্ষ পত্রিকায়।

এর অনেক পরে ১৩৩৬ সালে একটি গল্প 'দিয়ে নিয়ে' (কালীঘাটের কুকুর) লিখলেন। প্রবাসীতে তা ছাপা হয়ে বের হয়।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে অন্তঃপুরের মেয়েরা যখন সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকু সম্বল করে কাগজ এবং কলমের নিষিদ্ধ আকর্ষণে একটু একটু করে মজতে শুরু করেছেন তখন তাঁরা উপন্যাসের চাইতে আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা বা ডায়রিই লিখেছেন বেশি। একটি বিষয় লক্ষ করলে দেখা যাবে রামসুন্দরী বা কৈলাসবাসিনীরা জীবনের অপরাহ্ন বেলায় পৌঁছে যখন সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়েছেন তখনই বসে গেছেন স্মৃতিকথা বা আত্মকথা লিখতে। তাঁরা লিখেছেন সারা জীবনের না বলা কথা।

ইতিহাসের তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, মেয়েদের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষ ভাগে তবে লেখিকাদের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে। তৎকালীন বঙ্গ দেশের সমাজে মেয়েদের দিন যাপনের যাথার্থকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সংস্কার আন্দোলন

আর এই আন্দোলনের সাফল্য মেয়েদের জীবনেও যোগ করেছিল এক নতুন মাত্রা। শিক্ষার আলো তাঁদের মনের অনেক বন্ধ দুয়ারে আঘাত করা শুরু করে। ক্রমেই মেয়েরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার আলোয় খানিকটা আলোকিত এই সময়ের কিছু সচেতন মেয়ে সমাজের চারদিকে চেয়ে দেখলেন যে, কোথাও তাঁদের জন্য কোন সম্মানের আসন নেই, নেই কোন প্রস্তুতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পটভূমির।

আশালতার জীবনে তাঁর লেখালেখির প্রথম পর্বটি অতিবাহিত হয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতা ও দুই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি এক উত্তাল ঘূর্ণাবর্তের সময়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু, রুশ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, কল্লোর গাষ্ঠীর আবির্ভাব, গোটা পৃথিবী জুড়ে আর্থিক দূরবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ, আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি প্রভৃতি নানান রাজনৈতিক ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ঘটনায় সমস্ত দেশ এবং দেশবাসী যখন একটা সংকট পূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে সেই সময় আশালতা সিংহের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন এই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব আশালতার লেখার মধ্যে পড়েছিল। আশালতা তাঁর কৈশোর কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী — এঁদের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, পারিবারিক সূত্রে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির যাতায়াত ছিল আশালতাদের ভাগলপুরের বাড়িতে।

শ্রীমতী আশালতা সিংহের লেখা সতেরোটি (মতান্তরে উনিশটি) উপন্যাসের মূল চরিত্রে রয়েছে মেয়েরা। এই মেয়েরা হয় নাগরিক জীবনে কিংবা কিছু ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত। মূলত নারীর সমস্যা এবং নারীর প্রেম ঘটিত বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে আশালতার উপন্যাসগুলি।

আশালতার লেখা প্রথম উপন্যাস 'অমিতার প্রেম'। এই উপন্যাসে দেখি আধুনিক রুচিশীলা তরুণী অমিতা ভালোবেসেছিল অমিয়কে। অমিতার বাবা ভবানীবাবু পশ্চিমের এক শহরে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর ঐ শহরে থাকতে না পেরে কোলকাতায় মেয়ে অমিতাকে নিয়ে চলে এসে টালিগঞ্জে ছোট সুন্দর বাড়ি করে বসবাস করতে থাকেন। ছেলে অমল ইঞ্জিনিয়ার। অমলের স্ত্রী বীণা; অমল স্ত্রীকে নিয়ে দিল্লীতে থাকে। অমিতা বি.এসসি. পড়ছে। সেই সঙ্গে সে সাহিত্য চর্চা ও গানবাজনাও করে। পাশের বাড়ির লাজুক অমিয় অমিতাকে গভীরভাবে ভালবাসল। এদের শান্ত জীবনে

বিক্ষোভ এল যখন দাদা অমল স্ত্রী বীণাকে নিয়ে কোলকাতায় এল। অমিতা অমিয়র প্রেম-ভালোবাসা বৌদি বীণা সুনজরে দেখে না। বীণা তার আত্মীয় হেমেন্দ্রর সঙ্গে অমিতার বিয়ের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়। অমিতার ভালোবাসায় খাদ না থাকলেও আত্মসম্মানবোধ তার কাছে বড় হওয়ায় সে অমিয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ওদের বন্ধন সূত্র ছিঁড়ে যায় কিন্তু তা আবার জোড়া লাগে অমিয় বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর। অমিতার পিতা অমিয়কে স্নেহ করতেন এবং তিনি তাদের যোগসূত্র হয়ে রইলেন।

সমাজের গড়ে দেওয়া ছকের বাইরে পা বাড়িয়েছে আশালতার সৃষ্টি নায়িকা অমিতা। অমিতা শুধু বাংলা সাহিত্যই পড়ে না হুগো মোপাসাঁ মূল ফ্রেঞ্চ থেকে প'ড়ে রস গ্রহণ করে। অমিতা নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তেমনি। পাত্র নির্বাচনের বিসয়টি সে দৈবের হাতে বা লজ্জার খাতিরে পিতা-মাতার ওপর ছেড়ে দেয় না। নিজেই বাস্তবসম্মত পথে পাত্রকে নির্বাচন করে; আবার সামান্যতম আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আশালতা সিংহের লেখা 'মুক্তি' উপন্যাসেও আমরা পাচ্ছি নির্ম্মলাকে। নির্ম্মলা ধীর-স্থির, সংযত ব্যক্তিত্বময়ী নারী। নির্ম্মলার বিয়ের গয়না তার স্বামী যামিনী কিনে দিয়েছিল, তার গরীব পিতা সেগুলো কেনেন নি — এই সত্য কথাটি জানতে পেরে তার শ্বশুরবাড়ির লোক সত্যবাদী প্রগতিশীলা নির্ম্মলাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে।

বিবাহ পরবর্তীকালে পিতৃগৃহে ফিরেও নির্ম্মলা তার পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। এমনকি বাড়ির পরিচারিকাও তাকে নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছে। নিজের প্রিয় দাদাও বোনকে ভুল বুঝেছে। শ্বশুরবাড়ি পরিত্যক্তা বিবাহিতা মেয়ের প্রতি সমাজ যে কত নির্দয় ছিল নির্ম্মলার প্রতি বাপের বাড়ির লোকের ব্যবহারে তা বোঝা যায়।

আশালতার 'সহরের মোহ' উপন্যাসের নায়িকা শান্তা। কোলকাতার আধুনিক পরিবারের মেয়ে, শান্তা। স্বামী সুপ্রকাশ জীবিকাসূত্রে পশ্চিমের এক শহরে আসে। ওকালতিতে ঠিকমত পসার জমাতে না পারলে প্রবল আর্থিক অনটনে দিশেহারা সুপ্রকাশ পৈতৃক গ্রামে ফিরে যাওয়া স্থির করে। কিন্তু আগাগোড়া নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত শান্তা গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। শান্তা ঠিক করে গান শিখিয়ে, সেলাই করে সে সংসারের আর্থিক অনটন লাঘব করবে। যদিও এতে স্বামী সুপ্রকাশের পৌরুষে আঘাত লাগে। শান্তা চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা আশালতা সিংহ মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার দিকটি প্রতিষ্ঠিত করতে

চেয়েছেন।

'মানসী' উপন্যাসে সুরমা চরিত্রটিও আধুনিক শিক্ষিতা আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আশালতা এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন অসম বিবাহ। বাড়ীর অমতে ব্রাহ্ম সোমনাথকে সুরমা বিবাহ করে। যদিও বিবাহ পরবর্তীকালে সুরমা যখন নিজের নারীসত্ত্বাকে আবিষ্কার করে তখন সে শুধু কারও গৃহীনী — এই পরিচয়ের সীমায় অবদ্ধ থাকতে চায়নি।

আশালতার লেখা 'পরিবর্তন' উপন্যাসেও আশালতা দেখিয়েছেন শহরের শিক্ষিতা আধুনিক মনস্ক মেয়ে শিশিরের গ্রামে বিবাহ হওয়াতে কী ধরনের সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছে। শিশিরের সঙ্গে বিয়ে হয় সুবোধের। সুবোধ গ্রামের ছেলে। বিয়ের পর পল্লীগ্রামে এসে শিশির লক্ষ করে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ মেয়ের সময় কাটে পরনিন্দা-পরচর্চা করে। বলা বাহুল্য এ ধরনের এঁদো কূটকাচলি শিশিরের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিশির পল্লী উন্নয়নের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়ে মুক্তি খোঁজে।

আশালতার লেখা 'কলেজের মেয়ে' উপন্যাসে নায়িকা সুমিত্রা গান শেখা, ব্যাডমিন্টন খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছে। সে বি.এ. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। বিয়ের পরেও সে পড়াশুনা করতে পারবে অন্তত ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে পারবে — এই মানসিকতা নিয়ে সুমিত্রা বিয়েতে রাজি হয়েছিল। বিয়ের পরই সুমিত্রার ভুল ভাঙ্গে। সে দেখে শ্বশুরবাড়ির সকলেই তার কাছে সংসারের দেখাশুনা, শ্বশুরবাড়ির সকলের সেবা — এসবই আশা করে। এমনকি সুমিত্রা যখন বাপের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ার কথা মনস্থ করে তখনও সে তার মা-বড়দিদির কাছে এর জন্য সমর্থন পায়নি। তাদের মতে বিয়ের পর সুগৃহিনী হওয়াই মেয়েদের একমাত্র কর্তব্য।

শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা পরিবারের সকলের ইচ্ছের কাছে নিজের ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে কর্তব্য পরায়ণা সুগৃহিণীতে পরিণত হয়েছে।

'একাকী' উপন্যাসেও আশালতা হাজির করেছেন প্রতিভাকে, যে ছোট থেকেই পিতার প্রশ্রয়ে দাদা কল্যাণের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া থেকে পড়াশুনা সর্বত্র একইভাবে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর স্বামী

অজিত যেমন প্রতিভার মনকে বোঝেনি তেমনি তার মা-দাদাও প্রতিভার ইচ্ছেকে তেমন আমল দেয়নি। বিয়ের পর না হলেও সন্তানের জননী হবার পর প্রতিভা আর নিজেকে নিয়ে না ভেবে সংসারের সকল কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছে।

আশালতা সিংহের লেখা 'স্বয়ম্বরা' উপন্যাসে মালতী চরিত্রটির মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামে বসবাসকারী মালতী স্বনির্বাচিত পাত্র বিনয়কে বিবাহ করার জন্য সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে তুচ্ছ করে শহরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা। বহুযুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত প্রথাকে সে ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

আশালতার চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় আশাপূর্ণা দেবীর সমস্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পের নায়ক প্রায়ই নারী। তারা নায়িকা নয় কারণ তারাই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাক্যের ক্রিয়াপদের মতো কাহিনীতে চালিকা শক্তি তারাই। প্রথম বয়সে যদিও আশাপূর্ণা পুরুষের চোখে জীবনের দিকে তাকাতেন, সেটাই ছিল সমাজের বেঁধে দেওয়া সকলের অভ্যস্ত চোখ। এরপর তিনি যত পরিণত হন তাঁর কলম ততই চলে এলো নারীর হাতের মুঠোয়। একেবারে আঁচলের চাবির গোছাটার মতো তিনি পৃথিবীটাকে নিজস্ব নাগালের মধ্যে পেলেন, মানুষের দুর্বলতাগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করলেন ঘরোয়া কলমের খোঁচায়।

আশাপূর্ণাদেবীর লেখা প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। প্রথম উপন্যাসেই লেখিকার স্বাতন্ত্র্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তবে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাস। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), এর দু-তিন বছরের মধ্যে 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) এবং সাত বছর পর 'বকুলকথা' (১৯৭৪)। আশাপূর্ণা দেবীর কথায় — 'তিন যুগের পৃষ্টপটে আঁকা এই তিন কন্যার ছবি আমার এই সাহিত্য জীবনের প্রধান ফসল'[৮]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের কাহিনী সত্যবতীর ন'বছর বয়সে শুরু হয়ে সুবর্ণলতার ন'বছর বয়সে শেষ। এর পটভূমি সত্যবতীর পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহ নিত্যানন্দপুর এবং বারুইপুর গ্রাম এবং কোলকাতা শহর।

সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা তাঁর পিতা রামকালী চট্টোপাধ্যায়। পিতা ও কন্যার স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করে ভাবতেন — ''আহা মেয়েমানুষ তাই সবই বৃথা''[৯] কিন্তু পিতার এই ভাবনাকে ভুল

প্রমাণিত করে সত্যবতী নিজের জীবনকে 'বৃথা' হয়ে যেতে দেয় না।

শ্বশুরের রাতে বাগ্‌দিনীর বাড়ি যাওয়ার খবরে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে জানায়, এমন মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই — সে তাঁকে আর প্রণাম করবে না। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য শহর থেকে সাহেব ডাক্তার আনানো কিংবা গ্রামের বাড়ি থেকে স্বামী পুত্র সহ শহরবাসের সিদ্ধান্তও সে যুগের বিচারে রীতিমতো বৈপ্লবিক ঘটনা।

সত্যবতীর স্বামী নবকুমার পড়াশুনা শিখেছে। শহরে এসে চাকুরি করেছে। সত্যবতীর প্রখর বুদ্ধিবলে চিরকাল চালনা করেছে স্বামীকে। অনিমেষ দৃষ্টি রেখেছে যাতে কখনও স্বামী পুত্রদের নৈতিকতায়, ব্যবহারে কোনও চ্যুতি না ঘটে। বড় দুই পুত্র সন্তানের পর সুবর্ণলতাকে পৃথিবীতে আনতে অনেক দ্বিধা, অনেক অনিচ্ছা ছিল সত্যবতীর। কিন্তু সুবর্ণ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারই মধ্যে যেন নিজের আজীবনের অপূর্ণ স্বপ্নকে অবয়ব লাভ করতে দেখে সত্যবতী। সত্যবতীর শাশুড়ি এলোকেশী পুত্রবধূর উপর নিজের আক্রোশ মেটাতে নাতনী সুবর্ণকে তার মায়ের অনুপস্থিতিতে বিয়ে দেয় নিজের গ্রামের বাড়িতে।

বিয়ে হওয়া সুবর্ণকে ছাদনাতলায় দেখে এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সত্যবতীর গোটা পৃথিবী। সে নিজে যেখানে ছিল সেইখানটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণলতা। এক চুলও বদলায়নি কোন কিছু। সত্যবতী মুখ ফিরিয়ে নেয় সংসার থেকে। সুবর্ণলতা নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। সত্যবতীর জীবনে নিশ্চল ধ্রুবতারার মতো তার পিতা রামকালী ছিলেন কিন্তু মায়ের গৃহত্যাগে সুবর্ণর কাছে পিতৃপরিবারের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু অরুচিকর শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে থেকে সুবর্ণর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। অধিকার সর্বস্ব, রুচিহীন স্বামীর জন্য ভালোবাসার কোনও শ্যামল মরূদ্যান তৈরি হয় না সুবর্ণলতার হৃদয়ে। সংসারের মাঝে বড্ড একা সুবর্ণলতা; তার একমাত্র আশ্রয়স্থল গোপন লেখার খাতাটি। নিজের সযত্ন রক্ষিত খাতাগুলি সে তার সম্পর্কে ভাসুর অকৃতদার, আপনভোলা জগন্নাথের হাতে দিয়েছিল ছাপতে, ছেপেও এনেছিলেন তিনি কিন্তু সেই ভুলে ভরা কুৎসিৎ দর্শন বই বাড়িশুদ্ধ লোকের হাসির খোরাক হলে সেই দিনই ছাদে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত বই সেই সঙ্গে কৃপণের সঞ্চিত ধনের মতো খাতাগুলি পুড়িয়ে ফেলে সুবর্ণলতা।

আশাপূর্ণা দেবীর নিজের প্রিয় ফর্ম ছোটগল্প। ছোটগল্পে সত্যিই তিনি অসাধারণ শক্তিশালী, নির্ভীক। তাঁর নিজেরই হিসেব বলছে তিনি দেড় হাজারের বেশি ছোটগল্প আর দেড়শোর বেশি উপন্যাস লিখেছেন। তারপরে এই সংখ্যা অনেক বেড়েছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি জানতেন তিনি কতটা পারেন, কী পারেন। তাই কখনও তাকে বিফল হতে দেখা যায় নি। এত অজস্র লেখার মধ্যে তাঁর কোন পুনরুক্তিও নেই। নিজের মধ্যে ভগবান প্রদত্ত যে ক্ষমতা ছিল তার

সীমাকে নিজের হাতে টেনে টেনে যতদূর প্রসারিত করা যায়, তাই তিনি করেছিলেন। কল্পনাশক্তি, মনুষ্যচরিত্রে অবগাহন করে পাওয়া অমূল্য কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সর্বোপরি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও তার বিশ্লেষণ — সবই তাঁর লেখার প্রধান হাতিয়ার। অদ্ভুত সব পরিস্থিতি মাথায় এসেছে তাঁর। শিল্পী আশাপূর্ণা সত্য উন্মোচনে নির্মম। সংসারের কোনো বহু প্রশংসিত আদর্শ মানবিক সম্পর্কেই তিনি ভাবালুতার আড়ালে 'মহৎ' হয়ে বাঁচতে দেন না। মাতৃত্বের কিংবা পিতৃত্বের যে আদর্শ তথা মহিমান্বিত চেহারা আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃত, আশাপূর্ণার নির্মম সত্যদৃষ্টি তাদেরও এফোঁড় ওফোঁড় করেছে।

'আয়োজন' গল্পে মাতৃস্নেহ নয়, এখানে আক্রান্ত হয়েছ নাতির প্রতি দাদুর স্নেহ। বাঙালী সমাজ যা নিয়ে আবেগপ্রবণতার সীমা নেই। এই গল্পে দ্বন্দ্ব শ্বশুরে-পুত্রবধূতে। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে শিশু পৌত্র। শ্বশুরের নিষেধ ও শুভবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে অতি আধুনিকা মা ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যায়। এবং দাদুর ভয়কেই সত্য করে নাতি জ্বরে পড়ে। এই জ্বরে শিশুটির মৃত্যুকামনা পর্যন্ত চলে যায় দাদুর অবচেতনে। তীব্র অহংতৃপ্তির জটিল উত্তেজনা। শিশুর জ্বর মুক্তিতেই দাদুর মনে আনন্দের পরিবর্তে আসে এক অদ্ভুত পরাজয়বোধের অবসন্নতা। না, সোমনাথ দানব নন, অতি সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ — সংসারে যার কোন দাপট আর নেই। অহংয়ের এই ভয়ংকর চেহারা ফোটাতেও আশাপূর্ণার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। বাস্তবে মানুষ কত দুর্বল, কত ক্ষুদ্র কত অমহান্!

'ছুটি নাকচ' — আশাপূর্ণাদেবীর লেখা আরেকটি আশ্চর্য গল্প। গল্পটিতে দেখি — শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে মনিববাড়ির মেয়েটিকে বাঁচাতে হাসপাতাল থেকে ছেলে চুরি করতে গিয়ে জেলে যায় বাড়ির কাজের মেয়েটি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে দেখে গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে আর জেলফেরৎ মেয়েমানুষের ঠাঁই নেই — যদিও সেই জেলে যাওয়ার সুফল, অর্থানুকূল্যটুকু তার স্বামীই ভোগ করেছে। ছুটি পেয়ে স্বামী-পুত্রকে কাছে পাওয়ার যে আনন্দ, মমতাময় যে আশ্রয়টি জেলফেরৎ মালতী আশা করেছিল তার পরিবর্তে সে পেয়েছে ঘৃণা, অস্বীকৃতি। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হয় না — শেষ হয় এক গভীরতর মানবিতার আশ্বাসে, যেখানে বিধিবদ্ধ সামাজিক আশ্রয়টুকু হারালেও এই বিপুল জগৎ সংসারে মালতী নির্বান্ধব হয়ে পড়ে না। জীবন ফুরিয়ে যায় না। এই নবীন মিত্রতার সংকেতে, নতুন পথে, জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় তার।

শ্রীমতী জ্যোর্তিময়ী দেবীর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'। এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যৌথ পরিবারের ভাঙন। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ এবং ডান্ডী অভিযানের সময়কাল এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নীতিশ যৌথ পরিবারে থাকা প্রবল ও প্রধান লোকেদের অবিচারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায় পরিবার থেকে। সে আমেদাবাদে গিয়ে গান্ধীবাদে দীক্ষিত হন। ভগৎ সিং এর চরমপন্থী দলের সন্ত্রাসবাদের সংস্পর্শেও নীতিশ এসেছিল। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর আদর্শেই সে পথ চলে। পারিবারিক সব সংকীর্ণতা, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা সব ভুলে গিয়ে দেশের মুক্তিকেই ব্রত বলে গ্রহণ করলো। ডান্ডী অভিযানে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গিনী হয় কোলকাতার মেয়ে বীণা। কালো হওয়ার অপরাধে বীণার পাত্র জোটেনি। বীণাকে শক্তিময়ী করে তুলেছে তাঁর শিক্ষা তার ব্যক্তিত্বকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে তার স্বোপার্জনের ক্ষমতা; অভিজাত সম্পদবান ঘরের মেয়ে হয়েও আশ্রিতার নিরাপদ প্রাণ ধারনের বিনিময়ে সে বেছে নিয়েছে বৃত্তিজীবনের স্বাধীন কিন্তু শ্রমসাধ্য দিনযাপন। বীণা প্রশ্ন তুলেছে নারী পুরুষের আর্থিক সফলতার দাম নিয়ে, সে দামের সততা নিয়ে ''তার মনে হয় দামটা কিসের? টাকার তাহলে কি নয়? একটা ছেলে প্রফেসরের টাকা আর মেয়ে প্রফেসরের টাকার দামের তফাতটা কি?''[১০] সমাজের এই অদ্ভুত নিয়মকে করুণা করে বীণা এখন বলতে পারে — ''... একটা কালো কুৎসিত ছেলে যদি প্রফেসার হয়, তার দাম কিন্তু বিয়ের বাজারে কম হয় না।'' [১১]

গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যাও বীণার মুখে এরকম —

> ''... এতো শুধু নুনের কথা নয়, আহার্যে একান্ত দরকারি নুনের মতোই জীবনে স্বাধীনতার কথা। ... নুনহীন তরকারির মতো স্বাধীনতাহীন জীবনও বিস্বাদ।''[১২]

জ্যোতির্ময়ীদেবী তাঁর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে তুলে আনতে চেয়েছেন মহাকাব্যের ইতিহাসে উপেক্ষিত 'স্ত্রী পর্ব'কে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর 'স্ত্রী পর্ব' নামে একটি অধ্যায় আছে। যেখানে শতপুত্র হারিয়ে ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেন ভ্রমে লোহার ভীম চূর্ণ করেছিলেন, গান্ধারী অভিশাপ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, ধৃতরাষ্ট্রের শোক জ্ঞানের প্রসঙ্গ ছিল 'স্ত্রী পর্ব'-এ কিন্তু নেই সেই অগণিত নারীর কথা যাঁরা এই মহাযুদ্ধে আপনজনদের হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহাভারতকার একটি শ্লোকও ব্যয় করেন না সেই সব যাদব রমনীদের জন্য যাদের অর্জুনের চোখের সামনে থেকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল অর্বাচীন দস্যুদল। শুধুমাত্র মহাকাব্য নয় যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসও এই স্ত্রী পর্ব নিয়ে নীরব। জ্যোতির্ময়ীদেবী ইতিহাসের সেই অনুচ্চারিত অধ্যায়কে ভাষা দিতে চান। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ এর দেশভাগ ও স্বাধীনতার পটভূমিতে লেখা 'এপার গঙ্গা ওপার

গঙ্গা'' উপন্যাসের নাম তাই প্রাথমিকভাবে তিনি দিয়েছিলেন 'ইতিহাস স্ত্রী পর্ব'।

উপন্যাসের ভূমিকা 'আমার কথা'-য় জ্যোতির্ময়ীদেবী লেখেন —

> ''সে কথা লেখেননি ব্যাসদেব। কোন কালি কোন ধূর্জপত্রে সেকথা কোন্ পুরুষ কবি লিখবেন? সে কালি, কাগজ, লেখনী আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি। মহাকবি হলেও পুরুষ, কাপুরুষের নারীদেহের ওপর সেই অত্যাচারের বর্বর লাঞ্ছনার কাহিনী লিখতে পারে না। লজ্জা ধিক্কারে তাঁর লেখনী অভিভূত মূক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই পুরুষ কবি সেকথা লেখেননি। কাপুরুষ তো ইতিহাস লেখেনা। নারী কবি, মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি। তাই স্ত্রী পর্বের কোনো ইতিহাস নেই।''[১৩]

জ্যোতির্ময়ী তাঁর উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'য় সেই যবনিকা উত্তোলন করলেন। ইতিহাসে উপেক্ষিত স্ত্রী পর্বের একটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় পাদপ্রদীপের আলোয় — এই উপন্যাসের নায়িকা সুতারা।

নোয়াখালির দাঙ্গায় কিশোরী সুতারা তাঁর বাবা-মা এবং বিবাহিত দিদিকে হারিয়েছিল। সুতারা আশ্রয় পায় প্রতিবেশী তামিজুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে। তামিজুদ্দিন সাহেবের কন্যা সাকিনা সুতারার সহপাঠী, খেলার সাথী। সাকিনার মা সুতারাকে কন্যা স্নেহে বুকে আগলে রাখে। শরীর মনের ক্ষততে মলম লাগানোর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে কোলকাতায় সুতারার তিন দাদা এবং ভগ্নীপতির কাছে খবর যায়। তাদের দিক থেকে তেমন আগ্রহের সাড়া না মিললেও তামিজুদ্দিন আপন দায়িত্ববোধ থেকে সুতারাকে পৌঁছে দেন কোলকাতায় তার আত্মীয়দের কাছে। আর তারপর থেকেই প্রতিমুহূর্তের স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয় সুতারার। মুসলমানের ছোঁয়া মেয়ের স্পর্শ থেকে সংসারের পবিত্রতা রক্ষা করতে তার জন্য যখন নির্ধারিত হয়েছে স্কুল বোর্ডিং এর নির্বাসন, তখন সেই নির্বাসন থেকেই ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে সুতারা, শিক্ষার সোনার কাঠির ছোঁয়া তাকে দীক্ষা দিয়েছে একলা চলার মন্ত্রে।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর ছোট গল্পে রাজপুতনার মেয়েদের নিপীড়নের ছবি ফুটে ওঠে কোনো বীভৎসতার মধ্য দিয়ে নয়, তাদের জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের ঠাস বুনুনির মধ্য দিয়ে। রাজস্থানে মেয়েদের অভিশাপ মনে করা হয় — আজও সেখানে রূপ কানোয়ারের ঘটনা ঘটে, এমন গ্রাম আছে যেখানে বরাত আসে না। 'বেটিকা বাপ' (যা আজও রাজস্থানের গালাগালির ভাষা) গল্পে শিশু কন্যা হত্যা করেন ঠাকুমা স্বয়ং একটু বেশি পরিমাণে আফিং খাইয়ে দিয়ে। ধরা পড়েন এই 'স্নেহময়ী' মায়ের

বড় ছেলেরই কাছে। পঞ্চম কন্যা হলে হবে কি, মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জ্যাঠামশাই নাম দিয়েছিলেন পদ্মিনী। কিন্তু পঞ্চম কন্যার বেঁচে থাকাই বা কী লাভ?

সমাজের অনুশাসন সম্পর্কে জোড়ালো প্রশ্ন শুনতে পাই 'লালজী সাহেব' গল্পটিতে। পুরোনো সামন্ত প্রথায় রাজবাড়িতে বৈধ রানি ছাড়াও দাসী, বাঁদিদের রক্ষিতা করে রাখা হত। তাদের গর্ভজাত সন্তানরাও সম্মান পেত। লালজী বলা হত তাদের। কিন্তু ইংরেজ শাসন যে অধুনিকতার সৃষ্টি করল তাতে বৈধতার প্রশ্নের সামনে স্নেহের বন্ধনগুলো ধুয়ে মুছে গেল। এইরকম একটি মেধাবী ছেলে আজমিরের ভালো কলেজে পড়তে পেল না। কারণ সে অবৈধ সন্তান। মনের দুঃখে সে তখন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসাবে যোগ দেয়। সমাজের অনুশাসন যাদের সমাজেরই প্রত্যন্ত প্রদেশে ঠেলে দেয় তাদের সম্বন্ধে এই লেখিকার মমতা অসীম। জ্যোতির্ময়ীদেবী তাঁর 'পিঁজরা পোল' গল্পটিতে অগণিত নারী বাহিনীকে তুলে ধরেছেন, তাদের জীবনের হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের পিতৃতন্ত্র যাদের পরিত্যাগ করেছে সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে তাদের দেখা পাওয়া যায় কাশী শহরে। মানুষের কি বিপুল অপচয়। সহসা এই অপচয়ের গোড়ার কথা উঠে আসে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে — ''একান্ত দেহগত দরকারের উপর, অস্তিত্বের ওপর এই আদর্শের ভিত্তি।''[১৪] ''... ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব মেয়রই এই চিরন্তন এক পথ — এক প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন।''[১৫]

জ্যোতির্ময়ী দেবী বারে বারে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যে সমাজের অনুশাসন যাই বলুক, এরা ও আসলে মানুষ। 'মর্ত্যের অপ্সরা' গল্পটির শুরু নিষিদ্ধ পল্লিতে চাঁপাদাসীর মৃত্যু দিয়ে। যে পুরুষের যৌনলালসা চরিতার্থ করার জন্য বেশ্যাবৃত্তি, সেই পুরুষ কিন্তু কাঁধ দেয় না এসব মেয়েদের শবদেহ বহন করার সময়। শুদ্ধান্তঃপুরের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তৈরি বেশ্যালয় — এদেরকে অচ্ছ্যুৎ করে না রাখলে পুরুষশাসিত সমাজের দুমুখো নীতি চলবে কেমন করে? পুরুষ ঔপন্যাসিকের চোখে পাঠক কখনো দেখেছে পতিতা চন্দ্রমুখীর অবিচল এক নায়ক নিষ্ঠা (দেবদাস), কখনো পিয়ারি বাঈজির রাজলক্ষ্মী হয়ে ওঠা (শ্রীকান্ত) কিন্তু দেখেনি, কল্পনাও করেনি মৃত্যুর পর কী করুণ পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে তাদের জন্য। জ্যোতির্ময়ী দেবীর অভিজ্ঞতার ব্যাপক বিস্তারেই সম্ভব হয়েছে নারীচরিত্রের এই যন্ত্রণার রূপায়ণ, পুরুষের কল্পনা কখনো ছুঁতে পারেনি নারীর এই যন্ত্রণার জগতকে।

তথ্যসূত্র ও প্রসঙ্গ নির্দেশ —

১) দ্র. আশাপূর্ণা দেবী ঃ ভূমিকা, যা দেখি তাই লিখি, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন — লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া। পৃ. VIII

২) দ্র. সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ঃ 'পূর্বপত্র', এস. সি সরকার এন্ড সন্স, শ্রাবণ ১৩৭০, পৃ. ২১১

৩) দ্র. জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ 'স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাসংকলন-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ এবং স্কুল অব উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়, পৃ. ৫১৫

৪. দ্র. তদেব, পৃ. ৫১৬

৫. দ্র. নিলিমা সরকারের চিঠি, আশালতা সিংহ শিরোনামে, দেশ, ১০ মার্চ, ১৯৮৪, পৃ. ৬-৭

৬. দ্র. আশাপূর্ণা দেবী ঃ 'আমার ছেলেবেলার আর এক আশাপূর্ণা', পৃ. ৩১

৭. দ্র. তদেব, পৃ. ৩৮

৮. আশাপূর্ণা দেবী ঃ খেলা থেকে লেখা, পৃ. ৬৪

৯. আশাপূর্ণা দেবী ঃ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭১, সুবর্ণ জয়ন্তী, পুনমুর্দ্রণ মাঘ, ১৪১৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলতাতা - ৭৩

১০. দ্র. জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ 'বৈশাখের নিরুদ্ধেশ মেঘ', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, সম্পাদক-সুবীর রায় চৌধুরী, সহ-সম্পাদক অভিজিৎ সেন, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩ এবং স্কুল উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. দ্র. ঐ

১২. দ্র. ঐ

১৩. দ্র. জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ 'নারীর কথা' উদ্ধৃতি ঃ 'নারী মুক্তিবাদী জ্যোতির্ময়ী দেবী, যশোধরা বাগচী, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা - ৭৩ এবং স্কুল উইমেন্‌স্ স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১০

১৪) দ্র. ঐ